ভাবমূর্তি ও মানিকের স্বস্তিহীন রাজনৈতিক জীবন

সজল রায় চৌধুরী

যুগান্তর চক্রবর্তী একটি মোক্ষম কথা বলেছেন, ''মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের কথাসাহিত্যের এমন একজন লেখক যাঁকে নিয়ে আলোচনা মানেই সমালোচকের অগ্নিপরীক্ষা।''[১] এই পরীক্ষার জন্য কতটা প্রস্তুত হতে পেরেছি তার বিচার পাঠকরাই করবেন। এই নিবন্ধে আলোচ্য বিষয় দুটি। প্রথমটি, ভাবমূর্তির প্রসঙ্গ। দ্বিতীয়টি, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যাপিত রাজনৈতিক জীবনটি কেমন ছিল তা সমকালীন রাজনীতির নানা ঘূর্ণিস্রোতের নিরিখে বিচার করা। বলাবাহুল্য তাঁর সাহিত্যে প্রতিবিম্বিত জীবন ও শিল্পের কথা অনিবার্যভাবেই এসে পড়বে।

ভাবমূর্তি ঃ

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়েরি প্রকাশের পর থেকেই এই ভাবমূর্তির প্রসঙ্গটা বেশি করে উঠেছে। অনেকে মনে করেন এত বিস্ফোরক উপাদানে এই একান্ত রোজনামচার ঊষর ও হরিৎ ক্ষেত্রটি পূর্ণ যে দেবদূতেরাও সেখানে পা ফেলতে ভয় পাবেন। যুগান্তর চক্রবর্তী সেটি প্রকাশ করে আধুনিক পাঠকদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। ভাবমূর্তির কথাটা এসেছে এই ডায়েরি প্রকাশের উপলক্ষে। ড. সরোজমোহন মিত্র লিখেছেন, ''লেখক জীবিতকালে যা প্রকাশ করেননি বা প্রকাশের ইচ্ছা করেননি, তাঁর অবর্তমানে, তাঁর ব্যক্তিগত কাগজপত্র প্রকাশ করে সেই লেখকের ভাবমূর্তি পরিবর্তনের অধিকার কারো আছে কিনা সেটা নিশ্চয়ই ভাববার বিষয়।''[২]

'ভাবমূর্তি পরিবর্তন' কথাটার মধ্যে একটা সূক্ষ্ম মঞ্জুভাষণ (Euphemism) আছে। আসলে তিনি ভাবমূর্তির অবনমন বা ভাবমূর্তি নষ্ট করার কথা বলতে চেয়েছেন। মূর্তি নির্মাণ ও মূর্তিভাঙ্গা দুটি ব্যাপারেই মূল ধারার কমিউনিস্টদের দক্ষতা প্রবাদপ্রতিম। কথায় কথায় ব্যক্তিপূজার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি দিলেও বাস্তবে কমিউনিস্ট দেশ ছাড়া কোথাও নেতাদের মরদেহ অবিকৃতভাবে স্মৃতিমন্দির বানিয়ে সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয়নি। দেশনেতাদের নাম আটপৌরেভাবে উচ্চারণ এই সংস্কৃতিতে নেই। মহান লেনিন, মহান স্তালিন, মহান শিক্ষক মাও ছাড়াও দেশজ নেতারা শ্রদ্ধেয় নেতা, অন্তরের নেতা ইত্যাদি বিশেষণ সংযুক্ত হয়েই উচ্চারিত হন। এই ঘরানার বন্ধুরা বলে থাকেন, ঐতিহাসির নেতাদের অবদানের প্রতি এভাবেই শ্রদ্ধা জানান তাঁরা। সত্যি কি তাই? শ্রদ্ধা তো একটা ভালো মানবিক মূল্যবোধ। অলংকৃত বিশেষণ দিয়ে তাকে প্রকাশ করতে হয় না। এখানে যা প্রকাশ পেয়েছে তার নাম ভক্তি। ভজনা থেকেই তো ভক্তির আভির্ভাব। ভক্তি যুক্তি ও বিচারের পথ রোধ করে দাঁড়ায়। বিশ্বাস ও আনুগত্য এর পার্শ্বফল।

ভজনের বিপরীতে থাকে হনন। চরিত্রহনন। লেলিন, স্তালিন, মাও যেমন মহান, তেমনি ট্রটস্কি, জিনোভিয়েভ, কামেনেভ, বুখারিন, লিউ শাও চিরা গোড়া থেকেই হাড় বদমাস, পার্টির ভেতর তারা শত্রুশ্রেণির চর হিসেবে ঘাপটি মেরে বসে থাকে। উপযুক্ত সময়ে প্রতিবিপ্লবের হাত শক্ত করাই তাঁদের কাজ। সর্বজ্ঞ দলের অত্যাশ্চর্য বীক্ষণে ধরা পড়ে ঘাপটির ভেতর লুকিয়ে থাকা উপঘাপটি। এজন্য স্ট্রটস্কিবাদের বিরুদ্ধে বিজয় সম্মেলনে, যাঁরা কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন, জনশত্রু বলে অচিরে চিহ্নিত হয়ে তাদের অধিকাংশই 'যমদ্বারে মহাঘোরে' প্রেরিত হন। সুতরাং 'ভাবমূর্তি পরিবর্তন' এর ভুরি ভুরি নজির বিশ্বের মূলধারার কমিউনিস্টরা দেখেছেন।

চিন্তাটা এরকম — মহানদের জীবন, বাণী ও কর্ম ইতিহাসের পূর্বনির্দিষ্ট ধারার এক একটি নির্ভুল স্থানাঙ্ক। সুতরাং অধ্যয়ন ও চর্চার উদ্দেশ্য তাঁদের মহত্ব বোঝার চেষ্টা করা। সমালোচনাও বিরোধিতার কথা মনে জাগলে বুঝতে হবে শত্রুশ্রেণির ভাবনার প্রভাব তোমার ওপর পড়েছে। ভুলভ্রান্তি, দুর্বলতার উর্ধে এদের ভাবমূর্তিকে অক্ষুন্ন রাখার জন্য সত্য গোপন, ইতিহাস বিকৃতি এমনকি 'জনগণের স্বার্থে' জালিয়াতিও চলতে পারে।

অন্যদিকে গণতন্ত্র, (ঐতিহাসিক অর্থে বলতে গেলে বুর্জোয়া গণতন্ত্র) হাজার দুর্বলতা নিয়েও স্বাধীন আধুনিক মানুষের চাপে ক্রমাগত তথ্যভাণ্ডার খুলে দিচ্ছে। ফেলতে পারছে না মানুষের এই দাবি— 'জ্ঞাপন কর, জ্ঞাপন কর'' কমিউনিস্ট দেবমন্ডলের শাসনে ভাবমূর্তি রক্ষার মর্মবাণী — ''গোপন কর, গোপন কর, গোপন কর।''

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়েরি প্রকশের জন্য আপত্তি 'প্রগতিবাদীদের' দিক থেকেই আসবে, যুগান্তর চক্রবর্তী এরকম আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। সরোজমোহনের উদ্বেগ তাঁর আশঙ্কাকেই সত্যে পরিণত করেছে। অথচ মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠাতা মার্কস ও এঙ্গেলস এই 'গোপনকর' তত্ত্বে একেবারেই ঘিরে থাকা প্রিয়জনদের একটি শ্লেটে লিখে জানিয়ে যান, 'ফ্রেডি মার্কসের ছেলে''। মার্কসের সুন্দরী ও বিদূষী স্ত্রী জেনির সঙ্গিনী অবিবাহিতা হেলেন ডেমুথের গর্ভে এই 'অবৈধ' সন্তানের জন্ম। এই সত্যজ্ঞান কোনো আধুনিকমনস্ক পাঠককে বিচলিত করবে না। পুঁজির শোষণমূলক রহস্য উদঘাটনে মানবমনীষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন রেখে গেছেন মার্কস। এই অবদানের জন্য যে শ্রদ্ধা তাঁর প্রাপ্য, 'অবৈধ' সন্তানের পিতৃত্ব সেই শ্রদ্ধায় একটুও চিড় ধরাতে পারবে না।

আমাদের দেশের কমিউনিস্টদের 'ভাবমূর্তি' নিয়ে উদ্বেগ দ্বিগুন গভীর। কারণ তাঁদের ভাবনায় দুটি ধারা এসে মিশেছে; একটি তো মূলধারার কমিউনিস্ট আন্দোলনের ঐতিহ্যগত প্রাপ্য প্রকৃতি থেকে পাওয়া। অন্যটি ভারতীয় গুরুবাদের ধারা। অজ্ঞানতিমিরে অন্ধ শিষ্যের চোখ 'জ্ঞানাঞ্জন শলাকায়' যিনি খুলে দেন তিনিই তো গুরু। গুরুনিন্দা শোনাও পাপ।

এর সঙ্গে কঠিন শৃঙ্খলাবদ্ধ দলতন্ত্রের উপাদানটা যদি যোগ করা হয়, তবে স্বদলীয় মান্যবক্তির ভাবমূর্তি রক্ষার গুরুদায়িত্ব আরো স্পষ্ট হয়ে যায়।

শুধু কমিউনিস্টদের নয়, এদেশের মানুষের মানসপ্রকৃতিতে সাধারণভাবে এই ভাবমূর্তি সংরক্ষণের ব্যাকুলতা দেখা যায়। ধরা যাক গান্ধিজির কথা। তিনি খোলাখুলিভাবেই আত্মচরিতে অনেক কথা লিখে গেছেন। ছোটোবেলায় হাতের তাগা বিক্রি করে বন্ধুদের সঙ্গে মাংস খেয়েছিলেন। ১৪ বছর বয়স থেকেই প্রবল স্ত্রী সহবাস করেছেন, বিদেশে বন্ধুর সঙ্গে গণিকালয়ে গেছেন। অকপটেই স্বীকার করেছেন এসব। তাই তাঁর আত্মজীবনীর নাম 'আত্মকথা অথবা সত্যের প্রকাশ'।

কিন্তু 'বাপু' -ভক্তদের অনেকেই গান্ধিজির সমালোচনা সহ্য করতে পারেন না। তাঁর বিজ্ঞানবিরোধী বক্তব্য, ব্রহ্মচর্য নিয়ে উদ্ভট পরীক্ষা নিরীক্ষা ছাগলের দুধ নিয়ে বাড়াবাড়ি, কংগ্রেসের নির্বাচিত সভাপতি সুভাষচন্দ্রকে কার্যত পদত্যাগ করতে বাধ্য করা— এগুলোর চর্চা 'বাপু'র ভাবমূর্তির পক্ষে ক্ষতিকর বলে তাঁরা মনে করেন।

জগদীশ ভট্টাচার্য 'কবিমানসী লেখেন আজ থেকে প্রায় অর্ধশতাব্দী আগে। রবীন্দ্রনাথের জীবনে যে নারীরা এসেছেন তাঁদের

কথা। 'গুরুদেব' এর জীবননাট্যের এই অংশগুলি যাঁরা জানতেন তাঁরাও বইটি প্রকাশের সময় রবীন্দ্রনাথের ভাবমূর্তি নষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় ক্ষুব্ধ হন। এই ঘটনা নেতাজিপন্থীরা আজও পুরোপুরি হজম করতে পারেননি। কয়েকবছর আগে একটি বাংলা দৈনিকে সুভাষের প্রেমপত্র প্রকাশিত হলে ভক্তরা খেপে গিয়ে কাগজ পোড়ায়। এটা নাকি নেতাজি বিরোধী সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্ত এবং চিঠিগুলি জাল। তাঁরা ভাবেন, যিনি দেশকে মুক্ত করার জন্য দুঃসাহসী মহানিষ্ক্রমণ করেন, তাঁর মনে প্রেমের মতো নরম অনুভূতি জাগবে কেন। বিশেষ করে ওরকম একটা সংকট লগ্নে। এটা কি ঐ অগ্নিপুরুষের ভাবমূর্তি কলঙ্কিত করছে না? জনান্তিকে বলে রাখি, প্রেমপত্র ও দাম্পত্য সহ সুভাষচন্দ্রের জীবনের অজ্ঞাত কথা প্রকাশ পাওয়ায় আমাদের অনেকের মনে হয়েছিল, যাঁর ললাটে যৌবনের রাজটীকা পরানো। সেই সংগ্রামী যৌবনের মানবিক সত্তাসহ পূর্ণমূর্তিটি আমরা দেখতে পেলাম।

এবার দেখা যাক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোন 'ভাবমূর্তি পরিবর্তনের' আশঙ্কা সরোজ মোহন করেছেন? সে কথা তিনি স্পষ্ট করে বলেননি। তাই ডায়েরি প্রকাশের আগে ভাবমূর্তি কেমন ছিল এবং প্রকাশের পর কী কী পরিবর্তন হওয়া সম্ভব সেটা প্রকাশ্যজীবন ও ডায়েরি পাশাপাশি রেখে দেখা যেতে পারে।

দায়িত্বশীল পিতা, স্বামী ও পুত্র হিসেবে মানিকের যে জীবন ছবি ডায়েরিতে পাই, দাঙ্গার সময় মানুষের পাশে এসে দাঁড়ানোর যে সাহসী উদ্যমের বিবরণ দেখা যায় তা মানিকের ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বলই করে। মানিকের মদ্যাসক্তির কথা সেই সময়ের লেখক, প্রকাশক এবং পাঠকদের অনেকেই জানতেন। ডায়েরিতে হাসপাতালে মদসংগ্রহ করার নানা চতুর কৌশলের কথাও আছে। মৃগীরোগ, বিরাট সংসার টানার দায়, শরীরপাত করে লেখার পরিশ্রম, সাধারণ স্বাস্থ্যভঙ্গ — এসবের চাপে হয়রান মানিকের বন্দ্যোপাধ্যায়ের সামগ্রিক পরিস্থিতি বিচার করলে সংবেদনশীল মানুষ মদ্যাসক্তিকে 'নিয়তি' তাড়িত ট্র্যাজিক নায়কের মানবিক দুর্বলতা বলেই বিবেচনা করবেন। ভাবমূর্তি বিপন্ন হওয়ার কোনো কারণ দেখা যায় না। বাঙালি সাহিত্যপ্রেমী পাঠক, বেত্রপাণি জল্লাদ নয়। ডায়েরিতে দুটি তারিখে ঘোড়দৌড়ের জুয়ায় জেতা ও হারার কথা আছে। প্রেমেন্দ্র মিত্র, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরো কোনো কোনো সাহিত্যিক তখন রেসের মাঠে যেতেন এটাও কোন গোপন তথ্য নয়।

একটা তথ্য অবশ্য একান্ত গোপন যা ডায়েরি পাঠে জানা যায়। অল্পবয়সে মানিকের গণিকাগমনের কিছু অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি যখন ইসলামিয়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন, তখন একটা রিপোর্ট পেয়ে স্বস্তিনিঃশ্বাস ফেলেছিলেন, 'রক্তপরীক্ষার রিপোর্ট পাওয়া গেছে— গনো, সিফি দুটোই নেগেটিভ। এটা সুসংবাদ। প্রথম বয়সের সেই হৈ চৈ করা দিনগুলির কথা মনে করে একটা ভাবনা ছিল বৈকি।"[৩] অল্পবয়সের অভ্যাসের দরুন গনোরিয়া বা সিফিলিস হয়ে থাকতে পারে বলে মানিক যে আশঙ্কা করেছিলেন, এই তথ্য এখন আর কোনো শিল্পীসাহিত্যিকের ভাবমূর্তি ঘাতক হয়ে ওঠে না। মানুষের ব্যক্তিগত যৌন আচরণের কোনো ধারনাকেই নৈতিক বিচারের অধীনে আনা যায় না। এগুলো moral ও নয়, immoral ও নয়, amoral । তবে যৌনশুচিতা নিয়ে ভদ্রলোকদের মধ্যে একধরনের বাতিক কাটতে কাটতেও কাটেনি। দুর্ভাগ্য, বামপন্থী বলে পরিচিতদের মধ্যেই এর প্রাদুর্ভাব বেশি।

তবে এই একটি বিষয়ের জন্য সরোজমোহন, ডায়েরি না প্রকাশ করাই সঙ্গত হত বলে মন্তব্য করেছেন, তা মনে হয় না। ডায়েরির মন্তব্যমালার নানা অংশে, যাকে দুর্যোধনের ঊরু বলা যায়, এমন একটি বিষয় আছে। সেটি রাজনীতি সংক্রান্ত মার্কসবাদী, আমৃত্যু পার্টি অনুগত মানিকের ভাবমূর্তির পক্ষে সেটা কতটা অনুকূল এটা নিয়েই বোধহয় সংশয়। এবার তাহলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনীতির আলোচনায় ঢোকা যেতে পারে।

রাজনৈতিক সংস্রব, নিম্নবর্গের সংস্রব ঃ

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে রাজনৈতিক আবহাওয়া একেবারেই ছিল না। শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত, মেধাসূত্রে উচ্চাকাঙ্ক্ষী পরিবারের সন্তান মানিক পারিবারিক পরিবেশে থেকে রাজনীতির প্রতি কোনো আগ্রহই বোধ করেননি। তবে ব্যক্তিক্রমী এই সন্তানটি টাঙ্গাইলে থাকার সময় মাঝে মাঝে বাড়ি থেকে উধাও হয়ে মাঝি মাল্লাদের সঙ্গে কাটিয়ে আসতেন। এই অভিজ্ঞতা 'পদ্মানদীর মাঝি' লেখার সময় কাজে লেগেছে। মাঝে লাগা না লাগাটা বড়ো কথা নয়, নিম্নবর্গের মানুষের সঙ্গে মেলামেশার একটা স্বাভাবিক আগ্রহ তাঁর মধ্যে ছিল। মানিকের রাজনৈতিক সংশ্রবের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় তিনি যখন বাঁকুড়ার ওয়েসলিয়ান কলেজের ছাত্র। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের পর গণ আন্দোলনের রাজনীতিতে একটা শূন্যতা ও দিশেহারা ভাব দেখা যায়। গুপ্ত বিপ্লবী দলের কার্যকলাপ সারা বাংলায় বিস্তার লাভ করে। মানিকের সেই সময়ের সঙ্গী একজনের কথায় জানা যায়, ''তখন আমাদের মধ্যে অনেক রকমের Political party ছিল— অনুশীলন - যুগান্তর ইত্যাদি।...মানিক বিকেলে প্রায়ই সেই ছেলেটির সঙ্গে বেড়াত ও অনুশীলন পার্টিকে support করত।"[৪] তবে অনুশীলন সমিতির সঙ্গে কোনো সাংগঠনিক যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল বলে মনে হয় না। কোনোরকম সক্রিয় অংশগ্রহণের উল্লেখও কোথাও পাওয়া যায়নি।

এরপর ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত রাজনীতির সঙ্গে কোনো সংশ্রবের কথা পাওয়া যায়নি। যদিও এই সময় লবণ সত্যাগ্রহ ও আইন আন্দোলনে সারা ভারত উথাল পাথাল হয়েছিল। ১৯৩৬ সালে প্রগতিলেখক সংঘ গঠিত হয় সর্বভারতীয় স্তরে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'পদ্মানদীর মাঝি ও 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসের লেখক হিসেবে তখন স্বনামধন্য। কিন্তু তিনি ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত কোনো সংগঠিত আন্দোলনে থাকার কথা ভাবেননি। এমনকি সোমেন চন্দ হত্যার পর প্রতিবাদ সভায় (৮ মার্চ ১৯৪২) রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, অতুল চন্দ্র গুপ্ত, বিষ্ণু দে, গোপাল হালদার সহ বাংলার বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীরা উপস্থিত থাকলেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে ছিলেন না। ঐ বছর নভেম্বরে ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের প্রথম বার্ষিক সম্মেলনেও মানিক ছিলেন না। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারতীয় উপনিবেশকেও ব্রিটিশরা যুদ্ধে জড়িয়ে দিয়েছে। হাজার হাজার বন্দিতে জেলগুলি পূর্ণ। সুভাষচন্দ্র বসু ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের চোখে ধুলো দিয়ে দেশ থেকে বেরিয়ে পড়েছেন স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্য প্রয়াসে। হঠাৎ জার্মানি সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি জনযুদ্ধের লাইন নিয়েছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির এই তোলপাড় সময়েও মানিক ১৯৪৩ সালের আগে কোনো আন্দোলন বা সংগঠনে যোগ দেননি। সে যুগের গুণী লেখকদের মধ্যে বিভূতিভূষণ ছাড়া আর কারো জীবনে এমনটা ঘটেনি। সংবেদনশীল ও নিম্নবর্গের জীবনে আগ্রহী এক লেখক ভরা যৌবনে দেশের উত্তাল সময়ে রাজনৈতিক সংগ্রামের যে কোনো ধরনের সংগঠন থেকে দূরে ছিলেন কেন? এটা সমালোচনা নয়, কৈফিয়ৎমূলক প্রশ্নও নয়। মানিকের অন্তরস্বরূপকে বোঝার জন্যই এ-প্রশ্নের উত্থাপন।

তারাশঙ্কর কংগ্রেসকর্মী হিসেবে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে অন্তরিণ থাকেন। ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্য হন। ১৯৪২ সালে লাভপুর অঞ্চলে ব্যাপক মহামারী হলে ৩০-৪০টি গ্রামে ঘুরে ঘুরে জনসেবার কাজ করেন। এতে স্থায়ীভাবে তাঁর শরীর ভেঙে যায়। ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে একবছরের জন্য কারাবন্দির জীবন কাটিয়ে আসেন। ধাত্রিদেবতা, গণদেবতা,

মন্বন্তর, পঞ্চগ্রাম সহ নানা লেখায় এই বিপুল অভিজ্ঞতার ছাপ আঁকা।

সতীনাথ ভাদুড়ি সাতবছর ওকালতি করার পর ১৯৩৯ সালে পেশা পরিত্যাগ করে কংগ্রেসের সাধারণ কর্মী হিসেবে পূর্ণিয়া জেলায় গ্রামসংগঠনের কাজে যোগ দেন। ১৯৪১ এবং ৪২ থেকে ৪৪ পর্যন্ত রাজবন্দি হিসেবে জেলে থাকেন। 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' ও 'জাগরী' এই রাজনৈতিক ও সামাজিক অভিজ্ঞতার ফসল।

সুবোধ ঘোষের শিক্ষা পৃথিবীর পাঠশালায়। স্কুলের পর পড়া বন্ধ হয়ে যায়। কিশোর ছেলেটিকেই সংসার টানতে বিচিত্র সব পেশা বেছে নিতে হয়। সার্কাসের মোটবাহক, রুটি কারখানার সাইকেল ভ্যানচালক, মড়কের সময় টিকাদার, নৈশাবাসের রাতজাগা কন্ডাক্টর, ঝাড়ুদার, জিপসি দলের সঙ্গী। তিনি মুরগির খামার, মিষ্টির দোকান, সস্তা হোটেলের ব্যবসাও করেছেন। এমনকি অল্প কিছুদিন সন্ন্যাসী হয়েও থেকেছেন। অন্যদিকে ''ছেলেবেলা থেকে শালবন, পাহাড় আর জংলী ঝরণা — নদীর সঙ্গে মেলামেশার আনন্দ আমার জীবনে একটি মহৎ সঞ্চয়।''[৫] এরকম বিচিত্র মানুষটিও ১৯৪২ সালে ভারত ছাড় আন্দোলনের ডাকে সাড়া দিয়ে কারাবরন করেন। জাতীয় আন্দোলনের সহায়ক অভ্যুদয় গীতিনাট্য লিখে গ্রেপ্তার হন। 'কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ' ও 'কংগ্রেস পুস্তক প্রচার কেন্দ্র'র সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তুলনা করে কারও ভালোমন্দ নিরুপণ করার কোন উদ্দেশ্য নেই এই যাপনচিত্রে। এক একজন শিল্পীর জীবননাট্য এক এক ভাবে গড়ে ওঠে। সামূহিক ও ব্যক্তিজীবনের হাজারদুয়ারি রহস্য উন্মোচনের বিচিত্র সব চাবি সৃষ্টিশীলদের বৈশিষ্ট্য বুঝবার জন্যই অন্যদের সঙ্গে পার্থক্যের দিকগুলো দেখানো।

স্বভাবত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় একলা মানুষ ছিলেন। ইসলামিয়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার সময় আত্মীয় বন্ধুরা না এলে উদ্বিগ্ন হতেন, প্রতীক্ষা করতেন, কিন্তু একাকীত্ব যে দুর্বহ তেমনটা মনে করতেন না। তাঁর মনোভাব, ''একলা একলা বলেও খারাপ লাগে না। আমি তো চিরদিন একা।''[৬] এমন মানুষের সঙ্গে যূথের অনন্বয়টাই স্বাভাবিক। অথচ সামাজিক ও রাষ্ট্রিয় ব্যাপারে যূথবদ্ধ মানুষের সম্মেলক হস্তক্ষেপের নামই রাজনিতী। ইতিহীসের বিষয় এই যূথবদ্ধ মানুষ। সাহিত্যের বিষয় ব্যক্তিমানুষ। ইতিহাসের জনমণ্ডলী শক্তিমান কিন্তু আলাদা আলাদা মুখচ্ছবিহীন। সাহিত্যের প্রতিটি মানুষ স্বতন্ত্র মুখচ্ছবিযুক্ত। ইতিহাসে আমরা বনভূমিকে দেখি, সাহিত্যে দেখি বনভূমির ভ্রাতৃত্বে দাঁড়িয়ে থাকা আলাদা আলাদা বৃক্ষ। ১৯৩৮ এর মধ্যে মানিকের প্রধান উপন্যাস লেখা হয়ে গেছে। কলকাতার কলেজজীবন ছেড়ে ব্যক্তিমানুষের গভীর অন্তর্লোকে খুঁড়ে দেখার কাজে ১৯২৯ থেকে ৩৮ পর্যন্ত মানিক নিবিষ্ট। এই সময় নাগরিক মানিকের সঙ্গে চলমান অস্থির জগতের সম্পর্ক খুবই কম। নিম্নবর্গের মানুষ সম্বন্ধে তিনি আগ্রহী অথচ বৌদ্ধিক জগতে কাজকর্মের সূত্রে প্রধানত মধ্যবিত্তকেই চারপাশে দেখেছেন মানিক। সুযোগ মানিকের হয়নি। আগেই দেখেছি তারাশঙ্কর ও সতীনাথ ভাদুড়ির রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়েছিল একেবারে মাটির কাছাকাছি থেকে। মানিক নিক্ষিপ্ত হলেন শিক্ষিত তত্ত্বজ্ঞানী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে কাজ করতে। 'প্রতিবিম্ব' উপন্যাসে পার্টির যে চেহারা তিনি এঁকেছেন তার ভ্রান্তির উল্লেখ করেছিলেন চিন্মোহন সেহানবীশ। মানিক স্বীকার করে বলেন, ''অর্থাৎ গল্পটা কিছুই হয়নি এই বলতে চান তো? তা কি করে হবে বলেন? কতুটুকু জানি আপনাদের?''[১০]

এই সময় তিনি ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক শিল্পী সংঘে যোগ দিয়েছেন। কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান মাত্র কয়েকমাস পরের ঘটনা। সুতরাং একটা দলের অর্ধপরিচিত পরিবেশ গিয়ে পড়েন মানিক। তাঁর দলীয় জীবনের সুত্রপাতেই একটা হতবুদ্ধি ভাব দেখা যায়। সাহিত্যিক অসীম রায়ের চোখেও এ সত্য ধরা পড়েছিল। ''তাঁর (মানিকের -বঃ লেঃ) বিভিন্ন কথাবার্তা থেকে এরকম একটা ধারণা জন্মেছিল যে বোধহয় তিনি কিছুটা দিক্‌ভ্রান্ত। একটা ক্ষয়ের জগৎ থেকে তিনি যেন খুব তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসেই এমন এক জগতে প্রবেশ করেছেন যে - জগৎ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা বোধহয় অস্পষ্ট।''[১১]

পরবর্তী বারো বছরের পার্টি জীবনের কোনো পর্বেই মানিক খুব স্বস্তিতে ছিলেন না। এর কারণ সেই সময়ে মার্কসবাদ সম্বন্ধে দলের উপলব্ধি, কর্মকৌশল ও অভ্যন্তরীণ সংকীর্ণ কলহ। যুগান্তর চক্রবর্তী সঠিকভাবেই মন্তব্য করেছেন, ''কমিউনিস্ট পার্টি শুধু একটি রাজনৈতিক দল নয়, একটি সামগ্রিক জীবনদর্শনের শক্তি। কিন্তু শিল্পীর জীবনে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকার গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি বিশেষ কোনো দেশকালের কমিউনিস্ট পার্টির নিজস্ব চরিত্রের সঙ্গে শিল্পীর সমগ্রজীবনের দ্বন্দ্বময় সম্পর্কের এক জটিল ইতিহাসের উপর নির্ভরশীল।''[১২৬]

এই নিরিখেই আমরা মানিকের দলের স্বরূপটি বিবেচনা করতে পারি। প্রথমেই 'সামগ্রিক জীবন দর্শন' বা মার্কসবাদের কথায় আসা যাক। মার্কসের মৃত্যুর বারো বছর পর এঙ্গেলস মারা যান। এঙ্গেলসের মৃত্যুর (১৮৯৫) ঠিক অর্ধশতাব্দীর মাথায় মানিক ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। ইতিমধ্যে মার্কসবাদের নানা পাঠ পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। কাউটস্কি, রোজা লুকসেমবার্গ, ট্রটস্কি, লুকাচ, গ্রামসির মতো তাত্ত্বিকরা সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে ভিন্নতর পর্যবেক্ষণ উপস্থিত করেছেন। স্তালিনের নেতৃত্বাধীন সোভিয়েত ইউনিয়ানে মার্কসবাদ কার্যত রাষ্ট্রধর্মে পরিণত হয় এবং কমিন্টার্নের মাধ্যমে অনুগত কমিউনিস্ট পার্টিগুলি মার্কসবাদের এই ভাষ্য আসল ভাষ্য হিসেবে প্রচার করতে থাকে। মানিক এমনই অনুগত (বলা যায় অনুগতের অনুগত, কারণ পরাধীন ভারতে গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির মাধ্যমেই আন্তর্জাতিক মার্কসবাদের এই ভাষ্য আসল ভাষ্য হিসেবে প্রচার করতে থাকে। মানিক মার্কসবাদের সোভিয়েত ভাষ্যই গ্রহণ করেন। যদিও ভারতীয় পন্ডিত দামোদর ধর্মানন্দ কোশাম্বী দলতন্ত্রের বাইরে থেকে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সোভিয়েত ভাষ্যকে তত্ত্বগতভাবে অবৈজ্ঞানিক এবং ভারতের ক্ষেত্রে দৃশ্যতই অচল বলে খারিজ করে দেন। তবুও মানিককে এজন্যই দায়ী করা যায় না। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণের মরণপণ লড়াই, বীরগাথাতুল্য ইতিহাস ঐসময় সোভিয়েত সংশ্লিষ্ট সব চিন্তা ও কর্মকে মহনীয় করে তোলে লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে। মানিকের উপলব্ধিতে এই তত্ত্বের রূপ ও মহিমা কেমন ছিল? ''মার্কসবাদই যখন মানবতাকে প্রকৃত অগ্রগতির সঠিক পথ বাতলাতে পারে, অতীত কী ছিল বর্তমান কী হয়েছে এব কীভাবে কোন ভবিষ্যৎ আসলে জানিয়ে দিতে পারে তখন মার্কসবাদ সম্বন্ধে অজ্ঞ থেকে সাহিত্য করতে গেলে এলোমেলো উল্টোপাল্টা অনেক কিছু তো ঘটবেই।''[১৩]

বৌদ্ধিক জগত থেকেই তিনি আকৃষ্ট হলেন রাজনৈতিক মতাদর্শ মার্কসবাদের দিকে। ''১৯৩৮ সালে রমেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছ থেকে নিকোলাই বুখারিনের 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ (historical materialism : A system of Sociology) নামে একটি বই পড়বার জন্য চেয়ে নিয়েছিলেন, লিওনটিয়েভের মার্কসীয় অর্থনীতি বিষয়ক গ্রন্থও পড়েছিলেন।''[৭]

এই সময় শিল্প সাহিত্য প্রসঙ্গে মার্কস - এঙ্গেলসের একটি রচনা সংকলনও তিনি পড়েন। অনেক পরে ফুটপাত থেকে স্তালিনের 'Marxism and National Question' বইটা কিনেছিলেন বলে জানা যায়। মার্কসীয় সাহিত্য অধ্যয়নের ভিত মানিকের খুব মজবুত ছিল কি? অন্তত মজবুতির ছাপ তাঁর লেখায় নেই। সেইসময় সরোজ আচার্য, হীরেন মুখোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, চিন্মোহন সেহানবিশদের পাঠের ব্যাপ্তি নিঃসন্দেহে বেশি ছিল। আসলে মতাদর্শের জন্য একটা অস্থিরতা তখন গুপ্ত বিপ্লবী আন্দোলনের

অগ্রণী কর্মীদের মধ্যেও যেমন দেখা দিয়েছিল, তেমনি ছিন্ন ভিন্ন বাস্তবতাকে একটা চিন্তাসূত্রে বাঁধার জন্য মানিকের বিশ্লেষণী মনে একটা অস্থিরতা দেখা দিয়েছিল। ''মানিকের মন ছিল বৈজ্ঞানিকের...হৃদয়াবেগের চেয়ে সহজ যুক্তিবিন্যাসের উপর তিনি নির্ভর করতেন বেশি। বৈজ্ঞানিকের মতোই তিনি জীবনকে পর্যবেক্ষণ বিশ্লেষণ করে তার থেকে একটা সামান্য সূত্র আবিষ্কার করতেন। একটা ছক কেটে তৈরি হয়ে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করার দিকেই ছিল তাঁর ঝোঁক।''[১৮]

এই সময় সোভিয়েত ইউনিয়নভিত্তিক মূলধারার মার্কসবাদেও একটা ছক ছিল। স্তালিনের লেখা 'দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ' গ্রন্থে সমাজবিকাশের এক যান্ত্রিক সর্বজনীন ছক দেওয়া হয়। এটাই বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র নামে খ্যাত। একটা বিজ্ঞান পেয়ে গেলেন, ছক ও পেয়ে গেলেন মানিক।

বাস্তব রাজনীতির যোগাযোগও এর সঙ্গে জুটে যায়। মানবেন্দ্রনাথ রায় ও তাঁর সাথীরা সোভিয়েত ইউনিয়নে চর্চিত রাজনীতি থেকে নিজেদের আলাদা করলেও যুদ্ধের সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে দাঁড়িয়ে তাঁদের র‍্যাডিকাল ডেমোক্রাটিক পার্টি ব্রিটিশ যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সহায়তার লাইন নেয়। এদের সৌজন্যে মানিক ন্যাশনাল ওয়ারফ্রন্টের প্রচার দপ্তরে কাজ পান। কমিউনিস্ট পার্টিও জনযুদ্ধের নীতি নেয়। মানিক প্রথমে ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক শিল্পী সংঘে এবং অচিরে ১৯৪৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় মানিকের সাহিত্যসাধনার দিক থেকে মার্কসবাদে আসার আর একটা যৌক্তিক পথপরিক্রমার কথা বলেছেন। সেটিও ভেবে দেখার মতো। ''অন্তরময় মানুষের কথা আর বাইরের যন্ত্রণাময় মানুষের কথা একই দার্শনিক গ্রন্থিসূত্রে অন্বিত করা যাবে না। তাই মধ্যবর্তী পর্যায়ে মানিকবাবু নানা মুখে পথ খুঁজেছেন। এই পর্যায়ে মানিকবাবুর লেখায় ধীরে ধীরে কীভাবে নিরুপায় মানুষ অপেক্ষা মানুষের বিশ্লেষক মূর্তি প্রাধান্য বিস্তার করেছে তা দেখানো চলে। তারই অন্তর্নিহিত নানারকমের পরিণতিতে মানিকবাবু মার্কসবাদীদের সাধনার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন।''[১৯]

দলের মানিক, মানিকের দল ঃ

কমিউনিস্ট পার্টিতে মানিকের যোগদান কর্মী হিসেবে হয়নি। প্রথম থেকেই তিনি সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের অন্যতম নেতা, পার্টির জেলা পরিষদের সদস্য। শ্রমিক বা কৃষক এই মৌলিক সামাজিক স্তরের মানুষের মধ্যে সেবা ও সংগঠনের কাজ করতে করতে পোড় খেয়ে নেতৃপদে যাওয়ার ইতিহাস তার নয়। বলা বাহুল্য মার্কসবাদকে প্রায় ধর্মবিশ্বাসে পরিণত করা হয়েছে। মানিকের বিশ্বাসে এটি সত্য ও অগ্রগতির দিশারী। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সর্বজ্ঞ মার্কসবাদ। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নবদীক্ষিতের উৎসাহে এই বিশ্বাসের কথা যখনই বলছেন তখনই অলক্ষ্যে যুক্তিবাদী মানিকের মধ্যে কোথাও একটা প্রতিরোধ তৈরি হয়েছে। কারণ এর মধ্যে কোনো মার্কসবাদ নেই। মার্কসবাদি মেয়েরা মার্কস ও এঙ্গেলসকে একগুচ্ছ প্রশ্ন করেছিল। তাঁর আদর্শবাণী কোনটি, এই প্রশ্নের উত্তরে মার্কস বলেছিলেন— 'সবকিছুকে সংশয়ের চোখে দেখ।' নির্বিচার বিশ্বাস ও ভক্তির সম্পূর্ণ বিপ্রতীপে মার্কসবাদের অবস্থান। তখনকার দলের কাছ থেকে এই মার্কসবাদ মানিক পাননি। ফলে স্বাধীনচিত্ত মানিকের মনে সংশয় জাগতে শুরু করেছিল। এই পরিস্থিতির একটা সুন্দর ছবি সাম্প্রতিক একটি লেখায় দেখলাম - ''পার্টি মার্কস ও মার্কসবাদকে একটা বিশেষ ছাঁচে বেঁধে ফেলে। সেই ছাঁচ 'তাসের দেশে'র ছাঁচ। সেই ছাঁচ - ছাঁদের মধ্যে আছে একধরনের বন্ধতা, একধরনের (আ) বন্ধতা। এই (আ) বন্ধতায় প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। শ্বাস নেওয়া যায় না আর। শ্বাসরুদ্ধ এই পরিসরে নতুন কল্পনা, নতুন পাঠ অসম্ভব হয়ে ওঠে। অসম্ভব হয়ে ওঠে যে কোনো ধরনের তত্ব চিন্তা চর্যার সঙ্গে কোনো ক্রিটিকাল নিযুক্তি, কোনো অন্বেষী বিসংবাদ।''[২৪] মানিকের বৈজ্ঞানিক মনে সংক্ষিপ্ত অনুগত্যের পর্বের পরেই এসেছে সংশয়ের পর্ব। সাহিত্যও সংস্কৃতির সব প্রশ্নকে শ্রেণিদ্বন্দ্ব দিয়ে বোঝা যায়, এই যান্ত্রিকতা সম্বন্ধে সংশয় জেগেছে মানিকের, ''একটা প্রশ্ন মনে জেগেছে। শেক্সপিয়র যদি বুর্জোয়া সমাজের মর্ম বুঝে দূর ভবিষ্যতে তাকিয়ে সৃষ্টি করেছিল, বুর্জোয়া যখন বিপ্লবি তার নাটক কেন ফিউডালের ক্রোধ জাগায় নি, বুর্জোয়া বিপ্লবে যার ধ্বংস?''[১৫] সাহিত্য ও সমাজের জটিল গতিময় সম্পর্ককে দলীয় মার্কসবাদে যে সরল সমীকরণে দাঁড় করানো হয়েছে তাতে এ প্রশ্নের সদুত্তর নেই। একটা সময়ে মানিকের তাই মনে হয়েছে, ''সাহিত্যের নিজস্ব গতি ও সামাজিক গতির সম্পর্ক সম্বন্ধে ধারণা এদের অস্পষ্ট।''[১৬] আনুগত্য ও সংশয়ের দোলায় মানিক দুলেছেন। সময়ের নিরিখে প্রথমে সংশয় তার থেকে ভিন্নমত ও অবশেষে সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের নেতাদের সম্বন্ধে বিরক্তি জেগেছে। যেমন ১৯৪৬ এর ৩১ জানুয়ারি চীনের চেন হান সেঙ -এর বৈঠকে মানিক উদ্দীপিত। ''Dr. Seng স্মরণীয় মানুষ একঘন্টা কথা শুনে যেন নতুন অভিজ্ঞতা পেলাম।''[১৭] সেঙ কিন্তু চীনের সাহিত্যের বিকাশের এক অতি যান্ত্রিক পরিচয় রেখেছিলেন। চীনা সাহিত্য নাকি ''United National Front -এর সময় ছিল realist! যুদ্ধের সময় liberated area তে...creative constructive''[১৮] পার্টি লাইনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে একটা দেশের সাহিত্যাদর্শের এই সমান্তরাল পরিবর্তনের ধারণা যুক্তিহীন, অতিযান্ত্রিক। মাকি নবদীক্ষিতের উৎসাহে এই মত সমর্থন করেছেন। কিন্তু তিনবছ পর ১৯৪৯ এর জানুয়ারিতে মনে হয়েছে 'সাহিত্যের নিজস্ব গতির সম্বন্ধ সরল সমীকরণ নয়। কমিউনিস্ট বন্ধুরা শুধু কেতাবি কথা বলেন, dogmatic এবং এই সম্পর্কের সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা অস্পষ্ট।'

বস্তুবাদী দর্শনের সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধেও কিছু প্রশ্ন জেগেছে। বস্তু ও চেতনার ঊর্ধ্বে এক মহাশক্তির কল্পনা করেছেন জীবনের শেষ দু'বছর। পরমতত্বকী? প্রশ্ন জেগেছে। একান্তে বস্তুবাদী মানিক আর 'মায়ের দয়া' প্রার্থী মানিক গোপনে সংলাপ চালিয়েছেন। দলের কট্টর কাঠামোয় একথা তো প্রকাশ্যে কাউকে বলাও যায় না। 'চিরদিন একা' মানিক তাই সংশয়ে ক্ষতবিক্ষত হন।

দলের রাজনীতিতেও কি মানিক স্বস্তি পেয়েছিলেন? তাঁর কি মনে হয়েছিল যে সমাজ পরিবর্তনের যুদ্ধে এক সঠিক রাস্তায় তিনি চলেছেন নীচে পড়ে থাকা মানুষদের হাতে হাত ধরে? দেখা যাক ঐ সময়ের পার্টি লাইন।

পরাধীন ভারতবাসীর মতামতের কোনো তোয়াক্কা না রেখে ব্রিটিশ শাসকরা ভারতকে যুদ্ধরথের চাকায় বেঁধে ফেলেছিল। তখন কমিউনিস্ট পার্টির শ্লোগান ছিল এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে, না এক পাই, না এক ভাই, নিষিদ্ধ দল। জার্মানি রাশিয়া আক্রমণ করতেই এই যুদ্ধ নাকি জনযুদ্ধে পরিণত হল। তাই পার্টি লাহন বদলে গেল। অন্যদিকে ১৯৪২ এর ৯ আগস্ট 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে গেলেন। দ্বিতীয় সারি নেতা নেত্রীরা আত্মগোপন করে ভারত ছাড়ো আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এলেন। সাতারা, বালিয়া, কোলহাপুর আন্দোলনের এক একটা ভরকেন্দ্রে পরিণত হল। রেললাইন উপড়ে ফেলা, যোগাযোগ ব্যবস্থা স্তব্ধ করে দেওয়া, স্বাধীনতার ডাকে মাতঙ্গিনীদের মতো মায়েরা বেরিয়ে এলেন। কমিউনিস্ট পার্টিকে তখন ইংরেজ শাসকরা আইনসিদ্ধ করে দিয়েছে। আগস্ট আন্দোলন কমিউনিস্ট পার্টির মতে 'অন্তর্ঘাত ও বিশৃঙ্খলা'। বলা হল জাপানকে রোখার জন্য কংগ্রেস লীগ ঐক্য চাই। এই আন্দোলন ক্ষতিকারক। ''our appeal to congress men is destruction of national defence and anarchy against the people, is not the path to National Govt. but national suicide.''[১৯] কমিউনিস্ট পার্টি প্রথম কংগ্রেসের (মে ১৯৪৩) রাজনৈতিক প্রস্তাবে বলা হয়, ''যে-সব গোষ্ঠী পঞ্চমবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত তারা হল বিশ্বাসঘাতক বোসের (সুভাষ বোস - বঃ লেঃ) পার্টি 'ফরোয়ার্ড ব্লক, সি.এস.পি...ট্রটস্কিপন্থী বিশাসঘাতকদের শিবির, এরা দুর্বৃত্তদের দল।... এই তিন গোষ্ঠীকে জাতির জঘন্যতম

শত্রু হিসেবে প্রতিটি সৎ ভারতবাসীর গণ্য করা মিত্রপক্ষের সেনাবাহিনীদের ভারতের রক্ষাকর্তা হিসেবে জনপ্রিয় করতে হবে।

''পার্টির ফ্যাসিস্ট রিোধী সাংস্কৃতিক দেশপ্রেমিক দল ভারতীয় ও ব্রিটিশ সেনাদের মনোবল বাড়ানোর জন্য সাহায্য করবে।''[২০] কমিউনিস্ট পার্টির একটি রাজনৈতিক প্রস্তাবে ঘোষণা করা হয়, ''communists take a bold and open stand aginst strikes as they injure the defence of the country by holding up production.''[২১] 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে শ্রমিকদের অংশগ্রহণে কার্যকরী বিরোধিতার রাস্তা নেয় CPI। তা সত্ত্বেও আমেদাবাদ ও জামসেদপুর শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকরা ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে নেমেছে বলে ক্ষোভ প্রকাশ করে পার্টি।

বাংলার ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষে কমিউনিস্ট পার্টি মজুতদারির বিরুদ্ধে কথা বলে, সরকারী নীতির বিরুদ্ধে নয়। কিছু ক্ষুধার্ত মানুষ মজুত উদ্ধার করতে নিজেরা উদ্যোগী হলে তাকে Foodriot বা বা খাদ্য দাঙ্গা বলে নিন্দিত করা হয়। কমিউনিস্টদের কর্তব্য দাঁড়ায় ''bold intervention to Prevent food riots.''[২২] কারণ ''Not to do this is to open the door of food riots to let in the fifth column.''[২৩]

এর সঙ্গে গঙ্গাধর অধিকারীর জাতিসত্তা থিসিসের ভ্রান্তি যুক্ত হয়। ভারতের মুসলমান অঞ্চলের জনগোষ্ঠীকে আলাদা জাতিসত্ত্বা হিসেবে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার সহ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সমর্থন হয়। ভারত একটি বহুজাতিক রাষ্ট্র এই সঠিক অবস্থান থেকে শুরু করে কমিউনিস্ট পার্টি' ধর্মকেও জাতিসত্তা বিচারের অন্যতম মানদণ্ড ধরায় তাত্ত্বিকভাবেও কার্যত লেজে গোবরে হয়।

এরপর আবার ভুল 'ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়' পর্ব। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ডাক। পার্টি নিষিদ্ধ। জনগণের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত এই লাইন অচিরে মস্কো থেকে আসা শান্তি আন্দোলনের হুকুমনামায় সমাধিস্থ হয়।

মানিকের প্রতিক্রিয়া? 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনকারীদের ওপর সেনাবাহিনী মেদিনীপুরে যে বীভৎস সন্ত্রাস নামায় মানিক 'ভিটেমাটি' নামে একমাত্র পূর্ণাঙ্গ নাটকটিতে তার প্রতিবাদ করেন গোপনে। ১৯৪৩ সালে লেখা এই নাটকটি ১৯৪৬ এর আগে প্রকাশ করেননি।[২৪] ভিটেমাটি নাটকে আক্রান্ত গ্রামগুলির অবস্থান ও আক্রমণকারীদের সম্পর্কে ইঙ্গিত দেওয়া আছে। কিন্তু গ্রামবাসীদের প্রতিরোধের ছবি জীবন্ত। ন্যাশনাল ওয়ারফ্রন্টের চাকরে ও কমিউনিস্ট সংলগ্ন মানিকের মধ্যে আর একজন প্রতিবাদী মানিককে পেলাম যিনি আগষ্ট আন্দোলনকে পঞ্চম বাহিনীর কান্ড বলে মনে করেন না।

মানিকের একটি গল্প আছে 'ছিনিয়ে খায়নি কেন'। দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে লেখা। এর প্লটের নোট ডায়েরিতে পাওয়া যায়। ১৯৪৫ সালের পাতা। ''দুর্ভিক্ষপীড়িতেরা লুটে খায়নি কেন?—তারা অহিংস একথা ভুল — না খেয়ে দুর্বল ভোঁতা হয়ে পড়েছিল — যে তেজ লুট করার প্রেরণা দেয় তা ছিল না।''[২৫] মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লুটে খাওয়ার বিরুদ্ধে নয়। কিন্তু তাঁর পার্টির লাইন খাদ্যলুট ঠেকাতেই হবে। না হলে পঞ্চম বাহিনী হাত শক্ত হবে।

মানিক সংগ্রামী শ্রমিককে দেখতে চেয়েছেন। কিন্তু আহমেদবাদ, জামসেদপুরের 'ভারত ছাড়ো' পন্থী শ্রমিকরাই লড়াই করেছিল। কমিউনিস্টপন্থীরা ঘাড় গুঁজে যুদ্ধকালীন উৎপাদন চালিয়ে গিয়েছিল।

আগেই আমরা দেখেছি মানিক ফুটপাত থেকে স্তালিনের 'Marxism and National Question' কিনেছেন। তাঁর পার্টির তখনকার জাতিসত্তার লাইনে ধর্মকেও জাতিসত্তা বিচারের অন্যতম উপাদান হিসেবে ধরায় মানিকের কি মনে হয়নি পার্টি নেতৃত্ব ভুল লাইন নিচ্ছে?

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চিহ্ন' উপন্যাসটি জনপ্রিয় হয়েছিল, কমিউনিস্ট সমালোচকদেরও প্রশংসা পেয়েছিল। ১৯৪৫-এ ২১ নভেম্বর আজাদহিন্দ ফৌজের তিনজন অফিসারের মুক্তির দাবিতে ছাত্র মিছিল হয়। মিছিলের উদ্দীপনা ও পুলিশি সন্ত্রাসের সাক্ষী ছিলেন মানিক। সেই অভিজ্ঞতার অংশ হিসেবে তিনি আত্মজৈবনিক চরিত্র আঁকেন — অক্ষয়। আমরা আগেই দেখেছি আজাদ হিন্দ ফৌজ কমিউনিস্ট পার্টির চোখে জাপানি ফ্যাসিস্টদের হাতে গড়া দুর্বৃত্ত এবং তাদের নেতা সুভাষ চন্দ্র 'বিশ্বাসঘাতক বোস' ও জনগণের প্রধান শত্রু পঞ্চম বাহিনীর নেতা। সেই আজাদ হিন্দ ফৌজের তিন সেনাপতির মুক্তির দাবিতে উত্তাল ছাত্র বিক্ষোভ মানিকের কাছে কি এটাই জানিয়ে দেয়নি জনগণ থেকে এতদিন কী ভয়ঙ্করভাবে বিচ্ছিন্ন ছিলেন তাঁরা। এ-দিন লড়াইয়ের বাঁধভাঙ্গা স্রোত দেখে মানিকের মনে যে উল্লাস ডায়েরিতে ও গল্পে প্রকাশ পেয়েছে তা যুদ্ধকালীন পার্টিশাসনের অবদমন থেকে মুক্তির চিহ্ন।

পার্টি সংগঠনের ভেতরে কি মানিক মননচিন্তন বা বন্ধুত্বের স্তরে কোনো মুক্তি পেয়েছিলেন? সেই সময়ে শিল্প সাহিত্যে রজার গারোদি ও লুইস আরাগঁর বিতর্কের প্রতিফলন সব দেশের কমিউনিস্টদের মধ্যেই দেখা যায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই বির্তকে জড়িয়ে পড়েন। দুর্ভাগ্যক্রমে শিল্পসাহিত্য পার্টি লাইন বা শ্রেণিলাইন ধরে চলবে এই মতের পক্ষে দাঁড়িয়ে যান। এতে অবশ্য শেষ রক্ষা হয়নি। দক্ষিণ বাম দুদিক থেকে মানিক আক্রান্ত হন। প্রগতি শিল্পীদের মধ্যে সংকীর্ণ গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এবং হীন কৌশলে দলভারি করার কাজকর্ম মানিককে প্রতিদিন দীর্ণ করতে থাকে। মানিক সোজা কথা স্পষ্টভাবে বলতেই ভালোবাসতেন, ঘোঁটপ্রবৃত্তি তাঁর স্বভাবে একেবারেই ছিল না। তাই দলীয় সাহিত্যিক গোষ্ঠীতে তিনি ছিলেন গোষ্ঠীবহির্ভূত একলা মানুষ।[২৬]

মাসিক বসুমতির সম্পাদক মানিক কে পদ্মা নদীর মাঝির মতো আবার একটি উপন্যাস লিখতে অনুরোধ করেন। মানিক জানান ''তখনকার মন আর চোখ এখন আর নেই, যান্ত্রিক কলকাতার সংস্পর্শে এসে গ্রামীন সরলতাকে প্রায় ভুলতে বসেছি''।

পদ্মানদীর মাঝির যুগের চোখ, মন ও গ্রামীণ সরলতা হারানো মানুষ বৃহত্তর মহত্তর কোনো যুক্তিনিষ্ঠ মানবিকতায় নতুন অন্বয় খোঁজার চেষ্টা করেছিলেন কমিউনিস্ট পাটিতে। কিন্তু সেই সময়ের পার্টি জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন। সমালোচকদের কথা নয় পার্টি প্রস্তাবই বলছে— ''...the bulk of the nation and the patriots did not approve of our policy and thought it's a surrender.''[২৭] পার্টি জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন, মানিক উপদলদীর্ণ পার্টিতে আছেন কিন্তু বিচ্ছিন্ন। কাকে জানাবেন তাঁর ক্ষোভ? দায়িত্বশীল, কর্তব্যনিষ্ঠ মানিক মিটিং মিছিল ও দলীয় দায়িত্ব কর্তব্য পালন করে চলেন এক অনন্বিত অস্তিত্ব নিয়ে। আর একাকী কথা বলেন রোজনামচার সঙ্গে। কয়েকটি উক্তি—

ক) ''ময়দানে নার্সদের বক্তৃতা শুনলাম — বক্তৃতা কেমন একটানা কলের মতো হয়ে যাচ্ছে।''[২৮]

খ) ''প্রগতি সাহিত্যের সমস্যা। সেই কৃত্রিম একপেশে আলোচনা।''[২৯]

গ) ''প্রগতি রবীন্দ্রজয়ন্তী হিরণ সান্যালের কর্তালিতে ব্রাহ্ম অ্যারিস্টোক্রাটিক অনুষ্ঠান।''[৩০]

ঘ) অন্ধ্রে ভোটে শোচনীয় পরাজয়ের পর — ''কেলেঙ্কারি একেই বলে। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে গুরুতর ত্রটি আছে সন্দেহ নেই।''[৩১]

ঙ) ''সোজা কথায় বলা যায়—The CPI does not understand the mind of India.''[৩২]

সুতরাং নতুন করে উত্তরণের আশায় দলে আসা মানিক আশাভ্রষ্টই হয়ে রইলেন। তাঁর সৃষ্টিতে, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায়,

‘শিল্পের অভিজ্ঞান’ হারিয়ে গেল।

তথ্যসূত্র ঃ

১। সমগ্র মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বন্দ্বের দুই মুখ — যুগান্তর চক্রবর্তী। এবং মুশায়েরা। জানুয়ারি ২০০৮।

২। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়েরি প্রসঙ্গে — ডঃ সরোজ মোহন মিত্র। নন্দন, সমালোচনা সংখ্যা ১৩৮৪। বড়ো হরফ বর্তমান লেখকের।

৩। অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় — যুগান্তর চক্রবর্তী। দেজ পাবলিশিং ১৯৯০। পৃ. ২৪০

৪। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য — ডঃ সরোজ মোহন মিত্র। পঞ্চম সংস্করণ ২০০৪। পৃ. ১১

৫। কোরক সাহিত্য পত্র। প্রাক শারদ সংখ্যা ১৪১৫। পৃ. ৩৯৯

৬। অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়— ঐ। ঐ। পৃ. ২২৫ (বড়ো হরফ বর্তমান লেখকের)

৭। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় — মালিনী ভট্টাচার্য। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি ২০০৮। পৃ. ৭৯

৮। সরোজ মোহন মিত্র। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য। পৃ. ১৩

৯। বাংলা উপন্যাসের কালান্তর —সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় পঞ্চম সংস্করণ ২০০৩। পৃ. ২৮৪

১০। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রগতি লেখক আন্দোলন — চিন্মোহন সেহানবিশ। পরিচয়।। পৌষ, ১৩৬৩ থেকে ‘কোরক’ মানিক সংখ্যা ১৪১৪।। পৃ. ২৯৮

১১। প্রসঙ্গ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। অসীম রায়ের একটি সাক্ষাৎকারের অংশ। কোরক।। মানিক সংখ্যা।। ১৪১৪।। বড়ো হরফ বর্তমান লেখকের।

১২। সামগ্র মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ দ্বন্দ্বের দুইমুখ।। পৃ. ৪২

১৩। সাহিত্য করার আগে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।। সরোজ মোহন মিত্রের পূর্বোক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত।। পৃ. ৬৬

১৪। মার্কসীয় রাজনৈতিকতা—আজ কোন ভাঙ্গনের পথে? অঞ্জন চক্রবর্তী - অনুপ ধর।। শারদীয় গণবার্তা ১৪১৫।। পৃ.৯৯

১৫। অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।। যুগান্তর যুগান্তর চক্রবর্তী ডায়েরির অংশ।। পৃ. ১২২

১৬। ঐ।। পৃ. ১১৩

১৭। ঐ।। পৃ. ৮৫

১৮। ঐ

১৯। Pakistan and National Unity - The communist solution, ed. G. Adhikari, PPH, Bombay, 1943. National Question in India CPi Documents 1942-47 Odyssey Press-p. 78- এ উদ্ধৃত।

২০। ঐ।। পৃ. ৯৭ (বঙ্গানুবাদ)

২১। ঐ।। পৃ. ৯৯

২২। সি পি আই এর প্রথম কংগ্রেসের প্রস্তাব।। ঐ।। পৃ. ৭৪

২৩। ঐ।। পৃ. ৯৫-৯৬

২৪। সরণি/আশ্বিন ১৮১৫ ।। প. ১

২৫। অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।। ঐ।।. ৮৩

২৬। ১০.৮.৪৬ এ মানিকের চিঠি।। সরোজ মোহন মিত্র দ্রষ্টব্য।। পৃ. ৭৬

২৭। ঐ।। Political resolution. পৃ. ৯৪

২৮। ৩২ঃ অপ্রকাশিত মানিক বন্ধ্যোপাধ্যায় যথাক্রমে — পৃ. ১২৯,১৩৭,২০৩,২২৯,২৩৪, প্রবন্ধটি ‘রবিশস্য’ থেকে পুনর্মুদ্রিত।